সম্পাদকীয়

editorialamarbarta@gmail.com

জঙ্গি তৎপরতার আশঙ্কা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে মাস দুয়েক আগে পুলিশের তল্লাশিচৌকিতে দায়িত্বরত এক কনস্টেবলকে ছুরিকাঘাত করেছিল দুর্বৃত্তরা। তাদের ফেলে যাওয়া একটি ব্যাগ থেকে পাঁচটি হাতবোমা উদ্ধার করা হয়েছিল। এতে ধারণা করা হচ্ছে, তারা কোথাও হামলা চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং পুলিশের ওপর হামলা সেই পরিকল্পনারই অংশ ছিল। জাতীয় সংসদ ভবনসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিষিদ্ধঘোষিত একটি উগ্রবাদী সংগঠনের সদস্যরা হামলা চালাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ নিয়ে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে জঙ্গিবিরোধী একটা অবস্থান ছিল সরকারের পক্ষ থেকে। সে সময় কেউ কেউ অভিযোগ করতেন, সরকার ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত ও পাকাপোক্ত করার জন্য জঙ্গি নাটক করছে। ওই সময় অনেক জঙ্গিকে আটক করে কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। এরপর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পরপরই অনেক দাগি সন্ত্রাসীসহ জঙ্গিগোষ্ঠীর অনেককে কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর ২০২৬ সালের নির্বাচনী আবহে ঢাকার কেরানীগঞ্জের একটি মাদ্রাসায় বোমা তৈরির সময় বড় একটা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। সে সময়ও এই ঘটনা নিয়ে জঙ্গি তৎপরতার আশঙ্কা করা হয়েছিল। নির্বাচনের কারণে ঘটনাটি চাপা পড়ে যায়।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে জঙ্গিবিরোধী একটা অবস্থান ছিল সরকারের পক্ষ থেকে। সে সময় কেউ কেউ অভিযোগ করতেন, সরকার ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত ও পাকাপোক্ত করার জন্য জঙ্গি নাটক করছে। ওই সময় অনেক জঙ্গিকে আটক করে কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। এরপর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পরপরই অনেক দাগি সন্ত্রাসীসহ জঙ্গিগোষ্ঠীর অনেককে কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর ২০২৬ সালের নির্বাচনী আবহে ঢাকার কেরানীগঞ্জের একটি মাদ্রাসায় বোমা তৈরির সময় বড় ..

বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার মূল কারণ এখানকার মানসকাঠামোর মধ্যে না থাকলেও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সেটা নতুন আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে সালাফিজম চিন্তার ব্যাপক বিস্তৃতির সঙ্গে জঙ্গি তৎপরতার একটা যোগসূত্র আছে। শিক্ষিত বেকার তরুণেরা পড়ালেখা শেষে যখন ন্যূনতমভাবে বাঁচার জন্য অর্থ উপার্জন করতে পারে না, তখন তাদের জীবনের প্রতি একধরনের হতাশা তৈরি হয়। জঙ্গিগোষ্ঠীর লোকেরা মূলত এদের টার্গেট করে থাকে এবং সদস্য সংগ্রহ করার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করে থাকে।

রাজশাহী অঞ্চলের বাংলা ভাইয়ের বা একই দিনে একই সময়ে ৬৩ জেলায় বিচারালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত দেশের জনগণ আর ফিরে যেতে চায় না। সেটা রোখার জন্য জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর অপতৎপরতা প্রতিরোধ করা জরুরি। শুধু পুলিশ ও কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটকে সক্রিয় করে তা প্রতিরোধ করা যাবে না। আইন ও বিচারের মাধ্যমে কারাগারে বন্দী করে তাদের সাময়িকভাবে রোধ করা সম্ভব। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে তাদের নির্মূল করার জন্য নতুন ভাবনা ও পরিকল্পনার দরকার আছে। তাদের চিন্তা যেন সহজ-সরল ও বিশ্বাসী মানুষের প্রভাবিত করতে না পারে, সেটার জন্য কাজ করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মাদ্রাসা ও মিডিয়া বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে। এ জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বস্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, জঙ্গিবাদের কোনো সীমানা নেই। এটি একটি বিষবৃক্ষের মতো, যা প্রতিকূল পরিবেশে শুকিয়ে গেলেও সুযোগ পেলেই আবার অঙ্কুরিত হয়। তাই আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। উগ্রবাদমুক্ত নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে সতর্কতার কোনো বিকল্প নেই।

শুল্কমুক্ত গাড়ি

অন্য অযৌক্তিক সুবিধাও বাতিল করা প্রয়োজন

সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানিসুবিধা বাতিল করে আনা বিল জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। এখন রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলেই বিলটি আইনে পরিণত হবে। শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানিসহ সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের সুযোগসুবিধা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় কতটা ন্যায্য ও যৌক্তিক, তা নিয়ে বহু বছর ধরেই আলোচনা চলে আসছে। এ পটভূমি বিবেচনায় বর্তমান সংসদে বিলটি পাস হওয়ায় আমরা স্বাগত জানাই।

গত রোববার জাতীয় সংসদে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান 'দ্য মেম্বারস অব পার্লামেন্ট (রেমুনারেশন অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস) অর্ডার১৯৭৩ সংশোধন বিল' উত্থাপন করেন। বিলটির ওপর কোনো সংশোধনী প্রস্তাব ছিল না। এর ফলে কোনো আলোচনা ছাড়াই বিলটি সংসদে পাস হয়। এই বিল পাসের মাধ্যমে আইনের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধাসংক্রান্ত ধারা (৩সি) বিলুপ্ত করা হয়েছে। এ ধারা অনুসারে, সংসদ সদস্যরা তাঁদের পুরো মেয়াদকালে শুল্কমুক্তভাবে, উন্নয়ন সারচার্জ এবং আমদানি পারমিট ফি ছাড়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিবরণ ও শর্ত অনুযায়ী একটি গাড়ি, জিপ বা মাইক্রোবাস আমদানির সুযোগ পেতেন। এ ছাড়া পাঁচ বছর পর একইভাবে আরেকটি শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুযোগও পেতেন তাঁরা।

শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানিসহ সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের সুযোগসুবিধা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় কতটা ন্যায্য ও যৌক্তিক, তা নিয়ে বহু বছর ধরেই আলোচনা চলে আসছে। এ পটভূমি বিবেচনায় বর্তমান সংসদে বিলটি পাস হওয়ায় আমরা স্বাগত জানাই। গত রোববার জাতীয় সংসদে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান 'দ্য মেম্বারস অব পার্লামেন্ট (রেমুনারেশন অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস) অর্ডার১৯৭৩ সংশোধন বিল' উত্থাপন করেন। বিলটির ওপর কোনো সংশোধনী প্রস্তাব ছিল না। এর ফলে কোনো আলোচনা ছাড়াই বিলটি সংসদে পাস হয়। এই বিল পাসের মাধ্যমে আইনের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির ...

সংসদ সদস্যদের জন্য প্রথম শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানিসুবিধা চালু হয়েছিল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের চতুর্থ জাতীয় সংসদে। নির্বাচনী এলাকায় নাগরিকদের সঙ্গে সংসদ সদস্যদের যোগাযোগসুবিধার কথা সংসদ সদস্যদের প্রাপ্য বেতনভাতার সঙ্গে শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুযোগ তৈরি করা হয়েছিল। বাস্তবতা হচ্ছে এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বিগত সংসদগুলোয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের একটি বড় অংশ বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি করেছেন। শুল্কমুক্তসুবিধায় আমদানি করা গাড়ি চড়া দামে বিক্রি করারও বহু নজির সৃষ্টি হয়েছিল। এ নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার জন্ম হলেও অতীতে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে ঐক্য দেখা গেছে। আওয়ামী লীগের তিন মেয়াদে অন্তত ৫৭৬টি গাড়ি শুল্কমুক্তসুবিধায় আমদানি করা হয়েছিল। এসব গাড়ির আমদানিমূল্য (অ্যাসেসমেন্ট ভ্যালু ধরে) ৪২৮ কোটি টাকা। গাড়িগুলো সাধারণ মানুষের জন্য আমদানি করা হলে শুল্ককর দিতে হতো সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার বেশি। সংসদ সদস্যরা এমন গাড়িও আমদানি করেছেন, যার বাজারমূল্য ৯ থেকে ১২ কোটি টাকা।

রাষ্ট্র পরিচালনার ২ চ্যালেঞ্জ
অর্থনৈতিক চাপ ও জীবনযাত্রার

শামসুল আলম
সিনিয়র ব্যুরোক্রেট ও লেখক

বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালনার প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রতীয়মান হচ্ছে, তা হলো সরকারের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপ এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি। এই সংকট কেবল পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রভাব বিস্তার করছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানি খাতে মূল্য সমন্বয়, পরিবহন ব্যয়ের বৃদ্ধি এবং দীর্ঘস্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির চাপ সাধারণ মানুষের জীবনকে ক্রমেই কঠিন করে তুলছে। ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সরকারের প্রতি আস্থার ওপর একটি সূক্ষ্ম কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়ছে। এই বাস্তবতায় রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি সুসংহত, বাস্তবভিত্তিক এবং জনগণকেন্দ্রিক নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রশাসনিক কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা, সমন্বয় এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে বাজার ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর কার্যকর নজরদারি প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি, যাতে কোনোভাবেই কৃত্রিম সংকট, মজুতদারি বা অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করতে না পারে।

এ প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়গুলো আরও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন

বাজার তদারকি জোরদার করে নিত্যপণ্যের মূল্যস্থিতি নিশ্চিত করা এবং অসাধু ব্যবসায়িক চক্রের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা গ্রহণ।

নিম্ন ও মধ্যআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ, যাতে প্রকৃত উপকারভোগীরা সরাসরি সহায়তা পান।

জ্বালানি খাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও পূর্বানুমানযোগ্যতা নিশ্চিত করা।

বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে রফতানি বহুমুখীকরণ, প্রবাসী আয়ের আনুষ্ঠানিক প্রবাহ উৎসাহিত করা এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিয়ন্ত্রণ।

ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ঋণখেলাপি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি ও কর ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও ন্যায়সংগত করা।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, সময়ানুবর্তিতা এবং ব্যয়-সাশ্রয় নিশ্চিত করা।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জনআস্থা পুনর্গঠন ছাড়া কোনো নীতিই দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে না। তাই সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে স্বচ্ছতা, জনগণের সাথে কার্যকর যোগাযোগ এবং গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণের মানসিকতা অপরিহার্য। অংশগ্রহণমূলক নীতিনির্ধারণই পারে একটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ভিত্তি গড়ে তুলতে। অপরদিকে, আমাদের দৃষ্টি শুধু অভ্যন্তরীণ বাস্তবতায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বৈশ্বিক পরিস্থিতিও বর্তমানে অত্যন্ত সংবেদনশীল। মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং সম্ভাব্য সংঘাতের আশঙ্কা আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজার, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে জ্বালানি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি আরও তীব্র হওয়া এবং বৈদেশিক লেনদেনে চাপ সৃষ্টির ঝুঁকি রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের আরও সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে-

সম্ভাব্য বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় আগাম নীতিগত প্রস্তুতি গ্রহণ

জ্বালানি সরবরাহ ও কৌশলগত মজুদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা

আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামা পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত নীতিগত সমন্বয় করা

প্রবাসী আয়ের প্রবাহ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য নিরাপদ রাখতে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ জোরদার করা

শেষ কথা

এ কথা স্মরণ রাখা জরুরি যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কেবল প্রশাসনিক রুটিনে সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি একটি গভীর দায়িত্ববোধ, বাস্তবতাবোধ এবং জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বিত প্রয়াস। দায়িত্ববোধ, সততা, পেশাদারিত্ব এবং জনকল্যাণে অটল প্রতিশ্রুতি নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। চ্যালেঞ্জ যতই জটিল হোক, সম্মিলিত প্রচেষ্টা, দক্ষ প্রশাসন এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আমরা তা মোকাবিলা করতে সক্ষম হব-ইনশাআল্লাহ।

লেখক
সিনিয়র সচিব
Creator of 36 july

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যচুক্তি
শৃঙ্খল নাকি সম্ভাবনা

মেজর (অব:)
মো: আখতারুজ্জামান
সাবেক সংসদ সদস্য

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। কেউ বলছেন এটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সীমিত করেছে; আবার কেউ দেখছেন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হিসেবে। বাস্তবতা এই দুইয়ের মাঝামাঝি। এ চুক্তি জয়ের জন্য নয়, মূলত করা হয় ক্ষতি ঠেকানোর জন্য। সেই আত্মরক্ষামূলক সিদ্ধান্তের ভেতরেই লুকিয়ে আছে এমন সুযোগ, যা কাজে লাগাতে পারলে অর্থনীতির গতিপথ বদলে যাবে।

চুক্তিটি ২০২৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি দ্রুত স্বাক্ষর হওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, বিশেষ করে যখন ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন আসন্ন। কিন্তু এই তাড়াহুড়োর পেছনে ছিল তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক ঝুঁকিড় যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক অনিশ্চয়তা, ক্রেতাদের অর্ডার স্থগিতের ইঙ্গিত এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের চাপ। নির্বাচন-পূর্ব অনিশ্চয়তায় রফতানি খাতে আস্থা নষ্ট হলে কয়েক বিলিয়ন ডলারের অর্ডার সরে যাওয়ার ঝুঁকি ছিল। তাই সরকার সময়ক্ষেপণ না করে বাজার স্থিতি ধরে রাখতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়, যা রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর হলেও অর্থনৈতিকভাবে তাৎক্ষণিক ক্ষতি এড়ানোর জন্য জরুরি ছিল।

একই সাথে আরেকটি বাস্তবতা বিবেচনায় ছিল; নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার চুক্তির কিছু দিক পুনর্বিবেচনা করতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকারের পূর্ণ রাজনৈতিক ম্যান্ডেট না থাকলেও তাদের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ ছিল অর্থনৈতিক স্থিতি বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের আস্থা ধরে রাখা। তাই চুক্তিটি অংশত একটি নীতিগত ধারাবাহিকতার বার্তা হিসেবেও কাজ করেছে, যাতে বোঝানো যায়, বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি হঠাৎ পরিবর্তনের ঝুঁকিতে নেই এবং রফতানিপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে।

প্রেক্ষাপটটি পরিষ্কার করা দরকার। বাংলাদেশ প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১০-১২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করে, যার ৮০ শতাংশের বেশি তৈরী পোশাক (আরএমজি)। এই খাত সরাসরি প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে এবং আরো বহু মানুষের জীবিকা এর সাথে জড়িত। যদি হঠাৎ করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের শর্ত কঠোর হয়ে যেত বা শুল্ক ৫-১০ শতাংশ বেড়ে যেত, তাহলে বছরে ৫০০ মিলিয়ন থেকে এক বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত রফতানি হ্রাসের ঝুঁকি ছিল। অর্ডার চলে যেত প্রতিযোগী দেশে, অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যেত।

কোভিড মহামারীর সময় আমরা ৩০০ কোটি ডলারের বেশি অর্ডার বাতিল হতে দেখেছি। তখন প্রায় সহস্রাধিক কারখানা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয় এবং কয়েক লাখ শ্রমিককে সাময়িক ছাঁটাই অথবা বেতনহীন ছুটিতে পাঠানো হয়। বিশ্বব্যাপী পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের মোট রফতানি আয় একপর্যায়ে ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায়, যা দেখিয়েছে এই খাত কতটা ঝুঁকিপূর্ণ।দেশের খবর

এ বাস্তবতায় বাণিজ্যচুক্তিটির প্রয়োজন ছিল। এটি তাৎক্ষণিক ধাক্কা ঠেকিয়েছে এবং রফতানিপ্রবাহে স্থিতি এনেছে। কিন্তু এই স্থিতি বিনামূল্যে আসেনি। শুল্ক এখনো প্রায় ১৯ শতাংশ এবং নতুন নিয়মে উৎপাদন খরচ ৩-৫ শতাংশ বেড়েছে। ফলে স্পষ্ট, এই চুক্তি সরাসরি সুবিধা না দিলেও বড় ক্ষতি এড়াতে সাহায্য করেছে। বাস্তবে, চুক্তির আগে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা অর্ডার পুনর্মূল্যায়ন শুরু করেছিল এবং কিছু বড় ব্র্যান্ড সরবরাহ উৎস বৈচিত্র্যকরণের ইঙ্গিত দেয়। একই সময়ে ডলার সঙ্কট, জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের অস্থিরতা রফতানি খাতকে আরো দুর্বল করছিল। এই প্রেক্ষাপটে দেরি হলে আস্থাহীনতা বাড়ত এবং নতুন অর্ডার ঝুঁকিতে পড়ত। তাই দ্রুত চুক্তিতে পৌঁছানো ছিল বাজার ধরে রাখা ও আস্থা বজায় রাখার জরুরি কৌশল।

তবে এই চুক্তি শুধু আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টিতে দেখলে পুরো চিত্রটি ধরা পড়ে না। এর ভেতরে এমন কিছু সম্ভাবনা রয়েছে, যা এখনো আলোচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না। বিশেষ করে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাত, যেখানে বাংলাদেশ একটি বড় সুযোগের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই সুযোগটিই এই চুক্তির সবচেয়ে অবহেলিত দিক। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ই নীতিনির্ধারকরা এই খাতকে ভবিষ্যতের শক্তি হিসেবে দেখেছেন, বিশেষত আঞ্চলিক খাদ্যচাহিদা, কাঁচামাল প্রাপ্যতা এবং প্রক্রিয়াজাত পণ্য রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক আয় বহুগুণ বাড়ানোর সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে।

এখানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি, মানসম্মত কাঁচামালের স্থিতিশীল সরবরাহ এবং বৈশ্বিক মানদণ্ডে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশকে দ্রুত সক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। একই সাথে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিনিয়োগ, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের সংযোগ বাংলাদেশকে একটি কার্যকর আঞ্চলিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে রূপান্তরের পথে এগিয়ে নিতে পারে।

আমরা এখনো এ চুক্তির গুরুত্ব পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তা এখনো মূলত গার্মেন্টকেন্দ্রিক। ফলে যেসব খাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলো প্রায়ই আলোচনার বাইরে থেকে যায়।

এই চুক্তির মাধ্যমে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে একটি নতুন মডেল তৈরি হয়েছেড় আমদানি-প্রক্রিয়াকরণ-পুনরায় রফতানি। এর অর্থ হলো, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম, ভুট্টা বা সয়াবিনের মতো কাঁচামাল আমদানি করে দেশে তা প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে এবং পরে তা উচ্চমূল্যের বাজারে রফতানি করতে পারে। এই বাজারগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, মালয়েশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং তাইওয়ান, যেখানে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে।

এই দেশগুলোর অধিকাংশই খাদ্য আমদানিনির্ভর এবং স্থানীয় উৎপাদন দিয়ে চাহিদা পূরণ করতে পারে না। নগরায়ন, মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যস্ত জীবনযাত্রার কারণে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের চাহিদা বছরে ৫-১০ শতাংশ হারে বাড়ছে। অন্য দিকে উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ায় তারা কম খরচে প্রক্রিয়াজাত করতে সক্ষম দেশের ওপর নির্ভর করে। আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাঁচা গম এনে বিস্কুট বা নুডলস তৈরি করে বেশি দামে বিক্রি করতে পারি। এতে কারখানা বাড়বে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং একই পণ্য থেকে বেশি মূল্য সংযোজন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, তুলনামূলক কম শ্রম ব্যয় এবং শিল্প সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এই মডেল বাস্তবায়নের জন্য অনুকূল। সঠিক পরিকল্পনা ও অবকাঠামো থাকলে বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, যা নতুন শিল্প, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রার উৎস তৈরি করবে। বঙ্গোপসাগর ঘেঁষা অবস্থানের কারণে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে সহজে পণ্য পাঠানো সম্ভব। ফলে বাংলাদেশ ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থল হিসেবে একটি সম্ভাবনাময় আঞ্চলিক বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

এই সুযোগের গুরুত্ব আরো বড় একটি জায়গায়। বাংলাদেশ দীর্ঘ দিন ধরে একটি শ্রমনির্ভর অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত; কিন্তু এ ধরনের প্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে উঠলে দেশ ধীরে ধীরে মূল্য সংযোজনভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে পারবেড় যেখানে কেবল উৎপাদন নয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে বেশি আয় করা সম্ভব। এর ফলে একই কাঁচামাল থেকে বহুগুণ বেশি আয় করা যাবে।

প্রশ্ন হলোড় এই সুযোগটি এখনো আলোচনায় কেন আসেনি? কারণ এটি তাৎক্ষণিক ফল দেয় না। এটি সময়সাপেক্ষ এবং পরিকল্পনানির্ভর। অন্য দিকে ক্ষতি বা ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা সহজ এবং দ্রুত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এর সাথে আরেকটি বাস্তবতা জড়িত। আমাদের নীতি ও বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অনেকসময় স্বল্পমেয়াদি ফলের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়, ফলে দীর্ঘমেয়াদি শিল্পায়ন ও সক্ষমতা গঠনের সুযোগগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না। পর্যাপ্ত অবকাঠামো, সমন্বিত নীতি এবং দূরদর্শী পরিকল্পনার অভাবও এই সম্ভাবনাকে সামনে আনতে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে আমরা এই সুযোগের পূর্ণ মূল্যায়ন করতে পারছি না।

চুক্তির আরেকটি দিক হলো শিল্প ও বাণিজ্যের নতুন সুযোগ। তুলা আমদানি করে দেশে টেক্সটাইল উৎপাদন বাড়ানো, উন্নত সমুদ্রপথ ও বিমানপথ পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে লজিস্টিক খরচ কমানো এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর জন্য বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এসব মিলিয়ে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে একটি উৎপাদন ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে পণ্যের দ্বিমুখী (ঃড়ি-ধিু) যাতায়াত সহজ হবেড় একই পথে কাঁচামাল আসবে এবং প্রক্রিয়াজাত পণ্য রফতানি হবে, ফলে খালি জাহাজ বা বিমানের সংখ্যা কমে গিয়ে পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। দ্রুত লজিস্টিক ব্যবস্থার কারণে সময় সাশ্রয় হবে, ব্যবসায়ীদের আস্থা বাড়বে এবং অর্ডার সম্পাদনে ঝুঁকি কমবে। এতে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা বাংলাদেশকে একটি নির্ভরযোগ্য ও সুবিধাজনক সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে দেখতে শুরু করবে, যা আরো উন্নত ব্যবসায়িক সুবিধা ও নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়তা করবে।দেশের খবর

তবুও ঝুঁকিগুলো অস্বীকার করা যায় না। কৃষি খাত বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় পড়বে, ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলো চাপের মুখে পড়তে পারে এবং ডিজিটাল খাতে নীতিগত স্বাধীনতা কিছুটা সীমিত হতে পারে। তাই এই চুক্তিকে এক দিকে সুযোগ হিসেবে দেখলেও, সতর্ক থাকার দরকার আছে। বিশেষ করে ভর্তুকিপ্রাপ্ত ও উচ্চ উৎপাদনশীল বিদেশী কৃষিপণ্যের কারণে স্থানীয় কৃষকরা ন্যায্য দাম পেতে সমস্যায় পড়তে পারেন। ছোট ও মাঝারি শিল্পে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতার চাপ বাড়লে অনেক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে না পেরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যা কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। একই সাথে প্রযুক্তিনির্ভর খাতে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বাড়লে দেশীয় উদ্যোগ পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকবে এবং দীর্ঘমেয়াদে নীতিনির্ধারণের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হতে পারে।

ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়

ইতিহাস বলে, সঠিক নীতি, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঝুঁকিকে সুযোগে পরিণত করা সম্ভব। তাই এই চুক্তির সফলতা নির্ভর করবে আমরা কত দ্রুত এবং কার্যকরভাবে প্রয়োজনীয় করণীয়গুলো গ্রহণ করতে পারি তার ওপর।

প্রথমত, কৃষি খাতকে সুরক্ষা দেয়া এবং একই সাথে আধুনিকায়ন অত্যন্ত জরুরি। বিদেশী ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হলে স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এর জন্য দরকার উন্নত বীজ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, সেচব্যবস্থা এবং সংরক্ষণ সুবিধা বাড়ানো। পাশাপাশি ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। কৃষিকে শুধু উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতকে শক্তিশালী করা অপরিহার্য। এই খাতই দেশের কর্মসংস্থানের বড় অংশ বহন করে; কিন্তু প্রতিযোগিতার চাপে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। তাই সহজ শর্তে ঋণপ্রাপ্তি, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা দিতে হবে।

তৃতীয়ত, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত খাতে যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সেটিকে বাস্তবে রূপ দেয়া এখন সময়ের দাবি। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কর সুবিধা এবং স্পষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে আমদানি-প্রক্রিয়াজাতকরণ-পুনরায় রফতানি মডেল কার্যকর করতে হবে।

চতুর্থত, লজিস্টিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্দর, সড়ক, রেল এবং বিমান পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া দ্রুত ও সাশ্রয়ী বাণিজ্য সম্ভব নয়। একই সাথে কাস্টম ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করতে হবে।

পঞ্চমত, ডিজিটাল খাতে সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। বিদেশী প্রযুক্তি কোম্পানির প্রভাব বাড়ার সাথে সাথে দেশীয় উদ্যোক্তাদের শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, বাণিজ্য কৌশল আরো ভারসাম্যপূর্ণ করতে হবে। একটি মাত্র বাজারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার অন্যান্য বাজারে প্রবেশ বাড়াতে হবে। একই সাথে ভবিষ্যতে চুক্তির শর্ত উন্নত করার জন্য কৌশলগতভাবে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে জাতীয় স্বার্থ আরো ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়।

সবকিছু মিলিয়ে বলা যায়, এই চুক্তি না নিখুঁত সাফল্য, না সম্পূর্ণ ব্যর্থতা।

এটি এক বাস্তববাদী সমঝোতা, যা স্বল্পমেয়াদে স্থিতি এনে দিয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদে সম্ভাবনার দরজা খুলেছে।

শেষ পর্যন্ত সত্যটি খুব সরল। চুক্তি আমাদের বেঁধে দেয় না, আমাদের সিদ্ধান্তই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে।